بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ২৪ এপ্রিল, ২০২৬ মোতাবেক ২৪ শাহাদাত, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মহানবী (সা.)-এর সত্যবাদিতার সর্বোচ্চ মানদণ্ডের আলোকে তাঁর (সা.) উত্তম আদর্শ এবং মু'মিনদের প্রতি উপদেশ ও নির্দেশনার কথা গত খুতবায় উল্লেখ করা হয়েছিল, এ বিষয়ে আজও কিছু বলব। মহানবী (সা.) আমাদেরকে সত্যবাদিতার কোন মহান মানে পৌঁছাতে চান, সে সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে।

হযরত হাফস বিন আসেম (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন, **মানুষের মিথ্যাবাদী হবার জন্য এই চিহ্নই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু শোনে তা-ই মানুষের মাঝে বলে বেড়ায়।**

এই অভ্যাসটি সাধারণত মানুষের মাঝে দেখা যায়। জামা'তেও এই মন্দ অভ্যাসটি কিছু মানুষের মধ্যে অনেক বেশি রয়েছে। আমাকেও কেউ কেউ কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে লিখে দেয় যে, সে এই এই কাজ করেছে; কিন্তু তদন্তে বিষয়টি মিথ্যা প্রমাণিত হয়। এরপর যখন পত্রলেখককে জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমাকে একথা কে বলেছে? এটি তো সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা! তখন তারা বলে দেয়, 'আমরা শুনেছিলাম'। আর এই শোনার ওপর ভিত্তি করেই তারা পৃথিবীতে হইচই ফেলে দেয়। এমন লোকদের ভেবে দেখা উচিত, মহানবী (সা.) এমন লোকদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন।

অতঃপর একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের নিকট মিথ্যার চেয়ে অন্য কোনো স্বভাব বেশি অপছন্দনীয় ছিল না। কোনো ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সামনে মিথ্যা বললে তিনি খুবই কষ্ট পেতেন। তিনি (সা.) যদি জানতে পারতেন যে, সে মিথ্যা বলেছে, তাহলে তাঁর (সা.) খুব কষ্ট হতো এবং তিনি মনেও রাখতেন; যতক্ষণ না তিনি আশ্বস্ত হতেন যে, সে ব্যক্তি তা থেকে তওবা করেছে, নিজের সংশোধন করেছে এবং মিথ্যা বলা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকা আরম্ভ করেছে।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত, একজন নারী মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে নিবেদন করেন, আমার একজন সতীন রয়েছে; *অর্থাৎ আমার স্বামীর আরেকজন স্ত্রী রয়েছে।* আমার কি পাপ হবে যদি আমি আমার স্বামীর সম্পদ দ্বারা খুব বেশি পরিতৃপ্ত হবার ভান করি? অর্থাৎ আমি তার সামনে এটি প্রকাশ করি যে, স্বামী আমাকে অনেক কিছু দেয়, এই দেয়, সেই দেয়– যা সে আসলে আমাকে দেয় নি। আমি কেবল তাকে ক্ষেপাতে চাই, তাকে কষ্ট দিতে চাই। আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি তাকে যা দেওয়া হয় নি তা দিয়ে পরিতৃপ্ত হবার ভান করে, সে সেই ব্যক্তির মতো যে মিথ্যার দুটো পোশাক পরিধান করে।

অর্থাৎ, যেহেতু মানসিক কষ্ট দেবার জন্য এবং রাগান্বিত করার জন্য সে এই কথা বলেছিল। যাহোক, তিনি (সা.) বলেছেন, এটি সম্পূর্ণ ভুল কাজ। এর ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে, পোশাক শব্দটি এখানে রূপক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ হলো, সে ব্যক্তি

মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণকারী। সে মিথ্যার দুটি পোশাক পরে আছে; একটি সে গায়ে জড়িয়ে রেখেছে এবং অন্যটি লুঙ্গি হিসেবে পরেছে, অর্থাৎ নীচে বেঁধে রেখেছে। অর্থাৎ, সে আপাদমস্তক একজন মিথ্যাবাদী।

সুতরাং, অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তিনি (সা.) তাঁর অনুসারীদের মিথ্যা এড়িয়ে চলার উপদেশ দিয়েছেন।

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত; মহানবী (সা.) বলেছেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক হয়ে থাকে। আর যার মধ্যে এই স্বভাবগুলোর মধ্য থেকে একটি স্বভাব থাকবে, তার মধ্যে কপটতারও একটি স্বভাব থাকবে যতক্ষণ না সে তা বর্জন করে। (এগুলো হলো,) তার কাছে আমানত রাখা হলে সে খিয়ানত করে, যখন সে কথা বলে তখন মিথ্যা বলে, যদি সে অঙ্গীকার করে তবে তা ভঙ্গ করে এবং বিবাদে লিপ্ত হলে সে গালাগালি করে।

এই বিষয়গুলো এমন, যা কোনো না কোনোভাবে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মিথ্যার দিকে নিয়ে যায় অথবা এগুলোর মাধ্যমে মিথ্যার প্রকাশ ঘটে। সুতরাং এই নৈতিক দুর্বলতাগুলো হলো কপটতার লক্ষণ। এটি সামনে রেখে আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যে, আমাদের মাঝে এসব দুর্বলতা কতটা রয়েছে। কারণ এই বিষয়গুলো কপটতার দিকে নিয়ে যায়, আর মানুষ কখনোই মুনাফিক আখ্যায়িত হওয়া পছন্দ করে না।

অতঃপর, ভিত্তিহীন কথাবার্তা বা গুজব যারা ছড়ায় তাদের ব্যাপারে তিনি (সা.) কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত সামুরা বিন জুনদুব (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রায়ই তাঁর সাহাবীদের (রা.) এটিও জিজ্ঞাসা করতেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কি কোনো স্বপ্ন দেখেছে? মহানবী (সা.) যখন লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করতেন, তখন আল্লাহ্ যাদের ব্যাপারে চাইতেন– তারা বর্ণনা করুক, তারা তাঁর (সা.) কাছে বর্ণনা করতেন; অর্থাৎ যারা কোনো স্বপ্ন দেখতেন তারা তা বর্ণনা করতেন।

একদিন সকালে নিজের সম্পর্কেই তিনি (সা.) বলেন, গত রাতে আমি এই দৃশ্য দেখেছি। দুইজন আগন্তুক আমার কাছে আসে। তারা আমাকে জাগায় এবং আমাকে বলে, চলুন। আমি তাদের সাথে যাই আর আমরা এমন এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছি যে চিত হয়ে শুয়ে ছিল। আর অপর এক ব্যক্তি তার কাছেই লোহার একটি আঁকড়া বা কাঁটা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, *অর্থাৎ প্লায়ার্সের মতো বাঁকা একটি আংটা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।* আর সে শুয়ে থাকা ব্যক্তির মুখের একপাশে গিয়ে মাথার পেছন পর্যন্ত চিরে ফেলে, আবার তার নাক ও চোখ থেকে আরম্ভ করে মাথার পেছন পর্যন্ত চিরে অর্থাৎ একদিকের পুরো মুখমণ্ডলটি চিরে ফেলছিল।

এরপর সে সেখান থেকে সরে তার অন্য গালের দিকে যায়। অর্থাৎ প্রথমে ডান দিকে এটি করে, তারপর বাম দিকেও হুবহু তা-ই করে। দ্বিতীয় দিকে এই কাজ শেষ করার পূর্বেই প্রথম দিকটি আগের মতোই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসত, যা সে আগে চিরেছিল। তারপর সে আবার তার কাছে আসত এবং একই কাজ পুনরায় করত, অর্থাৎ আবার একইভাবে চিরে ফেলত। কারণ সেটি আগের মতো ঠিক হয়ে যেত।

মহানবী (সা.) বলেন, আমি বললাম, সুবহানাল্লাহ্! এরা কারা? তখন তারা দুইজন আমাকে বলল, শুনুন, আমরা আপনাকে এর প্রকৃত অর্থ বলছি। আপনি যে ব্যক্তির কাছে গিয়েছিলেন, যার মুখ পশ্চাৎগ্রীবা পর্যন্ত, নাকের এক পাশ থেকে ঘাড়ের পেছন পর্যন্ত এবং

চোখ ও ঘাড় পর্যন্ত চিরে ফেলা হচ্ছিল– সে হলো সেই ব্যক্তি, যে সকালে নিজের ঘর থেকে বের হয় এবং একটি মিথ্যা কথা রচনা করে যা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে; অর্থাৎ গুজব রটনাকারী ব্যক্তিরা এবং মানুষের নামে মিথ্যা কথাবার্তা রচনাকারীরা। কতক লোক এমন কিছু কথা কেবল উপভোগ করা বা মজা নেবার জন্য বলে থাকে, আবার কখনো কখনো সমাজে কারো দুর্নাম করার জন্যও এসব কথা বলা হয়। যে-কোনো অর্থে হোক না কেন, তারা ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে কথা বলে থাকে। সুতরাং, এমন লোকেদের সর্বদা মনে রাখা উচিত, এটি একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ, আল্লাহ্ তা'লা এর জন্য পাকড়াও করেন এবং শাস্তি দেন। তাই এটি অত্যন্ত ভয়ের বিষয় এবং এর জন্য অনেক বেশি ইস্তেগফার করা প্রয়োজন। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন হারিস (রা.) কর্তৃক একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে, তিনি এই রেওয়ায়েতটি হযরত হাকীম বিন হিযাম (রা.)-র বরাতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্র রসূল (সা.) বলেছেন, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই পৃথক না হওয়া পর্যন্ত ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি রহিত করে দেবার অধিকার রাখে; অর্থাৎ, যা-ই কেনাবেচা করুক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এক জায়গায় আছে– সেটি বাতিল করার অধিকার তাদের আছে। কিন্তু যখন পৃথক হয়ে যায় তখন আর সেই অধিকার থাকে না। অথবা তিনি (সা.) বলেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পৃথক না হয়। যদি তারা উভয়ে সততার ভিত্তিতে কাজ করে এবং পরিষ্কার কথা বলে, তাহলে ব্যাবসায় উভয়ের জন্য বরকত দান করা হবে। আর যদি তারা উভয়ে প্রকৃত অবস্থা গোপন করে এবং মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত হারিয়ে যাবে।

ব্যাবসা-বাণিজ্যের অনেক বিবাদ মিথ্যাভিত্তিক কার্যকলাপের কারণে হয়ে থাকে এবং আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের কথাবার্তা ও ব্যাবসা-বাণিজ্যে কল্যাণ দান করেন না। পার্থিব জীবনে তাদের যে ক্ষতির সম্মুখীন হবার তা তো হয়ই, অধিকন্তু তারা আল্লাহ্ তা'লার সমীপেও পাপী সাব্যস্ত হয় এবং শাস্তি ভোগ করে।

অতঃপর হযরত ইবনে উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **যখন কোনো বান্দা মিথ্যা বলে, তখন সে যে অপরাধটি করেছে তার দুর্গন্ধের কারণে ফেরেশতা তার কাছ থেকে এক মাইল দূরে চলে যায়।**

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) শস্যের একটি স্তূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি (সা.) স্তূপের ভেতরে নিজের হাত ঢুকিয়ে দিলে নিজের আঙুলে আর্দ্রতা অনুভব করেন; *ভেজা ভেজা অনুভূত করেন।* তিনি (সা.) বলেন, হে শস্যের মালিক! এই যে শস্য তুমি বিক্রি করছ, *তা গম, ভুট্টা বা অন্য যে শস্যই ছিল*, ব্যাপার কী? এটি ভেতর থেকে ভেজা কেন? সে নিবেদন করে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এগুলো বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছিল। তিনি (সা.) বলেন, তাহলে তুমি সেগুলো লুকিয়ে রাখার পরিবর্তে শস্যের ওপরে রাখলে না কেন? যদি এর ওপরে বৃষ্টি পড়ার কারণে ভিজে গিয়ে থাকে তাহলে তা ওপরে রাখা উচিত ছিল যেন মানুষের জন্য তা দেখা সম্ভব হয়। তিনি (সা.) আরও বলেন, **যে ধোঁকা দেয় তার সাথে আমার সম্পর্ক নেই।** ব্যবসায়ীদের এতটুকু সূক্ষ্মতার সাথে এ বিষয়টি দেখা উচিত। এটিই সেই মান যা তিনি (সা.) একজন মুসলমানের মধ্যে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজ প্রতারণামূলক ব্যাবসা এবং মিথ্যার কারণে মুসলমানরাই পৃথিবীতে দুর্নাম হচ্ছে।

অতএব, আজ আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করে মহানবী (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার অর্থে ঈমান আনয়নের ঘোষণা দেই, আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজে সত্যের সর্বোচ্চ মান বজায় থাকা উচিত। অন্যথায় মহানবী (সা.) বলেছেন, যদি এটি না থাকে, তাহলে তোমরা আমার দলভুক্ত নও; তোমাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। অসংখ্য উপদেশ ও নির্দেশনার মাধ্যমে তিনি (সা.) সত্যকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে তা অবলম্বন করার জন্য নসীহত করেছেন। সত্যের ওপর সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি প্রকৃত মুসলমান হতেই পারে না।

তাঁর (সা.) জীবনচরিতের আলোকে এখন আমি কিছু বিষয় উপস্থাপন করছি। তিনি (সা.) সর্বদা সত্যকথন এবং সততা ও বিশ্বস্ততায় সবার চেয়ে অগ্রগামী থাকার কারণে মানুষের নিকট 'সাদিক' (তথা সত্যবাদী) এবং 'আমীন' (তথা বিশ্বস্ত) হিসেবে সুপরিচিত ছিলেন। জনৈক লেখক লিখেছেন, মুহাম্মদ (সা.) অজ্ঞতার যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর (সা.) পূর্বে তাদের কাছে কোনো সতর্ককারী আসে নি। *অর্থাৎ তাঁর জাতিতে ইতঃপূর্বে কোনো নবী আসে নি।* লোকেরা প্রতিমা, মূর্তি এবং শয়তানের পূজা করত। তাদের মাঝে থাকা অবস্থায় শৈশবকালেই তাঁকে প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি দান করা হয়েছিল, অথচ তিনি (সা.) শয়তানি চক্র এবং মূর্তিপূজারীদের মাঝেই বসবাস করেছেন। তিনি (সা.) কখনো কোনো প্রতিমার প্রতি আকৃষ্ট হন নি এবং কখনো তাদের সাথে কোনো উৎসবেও যোগদান করেন নি। তাঁর (সা.) মুখ থেকে কখনো কোনো মিথ্যা কথা শোনা যায় নি। মানুষ তাঁকে (সা.) 'সদুক' অর্থাৎ পরম সত্যবাদী, আমীন, ধৈর্যশীল এবং অত্যন্ত দয়ালু মনে করত। এমনকি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, ইসলামের আগমনের পূর্বে অজ্ঞতার যুগেও মহানবী (সা.)-কে দিয়ে বিচার-সালিশ করানো হতো।

এ বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে এক স্থানে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে বর্ণনা করেন:

তাঁর (সা.) উত্তম চরিত্র সম্পর্কে সর্বসম্মত সাক্ষ্য সেটিই যা তাঁর জাতি প্রদান করেছিল, তাঁর নবুওয়তের দাবির পূর্বেই তাঁর জাতি তাঁর নাম রেখেছিল 'আমীন' ও 'সিদ্দীক'। পৃথিবীতে এমন মানুষ অনেক আছে যাদের বিরুদ্ধে অসাধুতার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমন মানুষও অনেক আছে যাদের কোনো কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় না। তবে তারা সাধারণ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয় এবং তাদের বিশ্বস্ততা অটুট থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের জাতি তাদেরকে কোনো বিশেষ উপাধি প্রদান করে না। কেননা, বিশেষ উপাধি তখনই দেওয়া হয় যখন কোনো ব্যক্তি কোনো বিশেষ গুণে অন্য সব মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক সৈন্যই নিজের জীবন বাজি রাখে, কিন্তু ব্রিটিশ জাতিও প্রত্যেক সৈনিককে 'ভিক্টোরিয়া ক্রস' উপাধি দেয় না, আর জার্মান জাতিও প্রত্যেক সৈন্যকে 'আয়রন ক্রস' সম্মাননা প্রদান করে না। ফ্রান্সে জ্ঞানচর্চাকারী লক্ষ লক্ষ মানুষ রয়েছে, কিন্তু প্রত্যেকে 'লিজিয়ন অব অনার' (**Legion of Honour**) সম্মাননা লাভ করে না। কাজেই, কেবল কোনো ব্যক্তির বিশ্বস্ত বা সত্যবাদী হওয়া তার শ্রেষ্ঠত্বকে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলে না। কিন্তু কোনো ব্যক্তিকে গোটা জাতির পক্ষ থেকে 'আমীন' এবং 'সিদ্দীক' উপাধি দেওয়া একটি অসাধারণ বিষয়। মক্কাবাসীরা যদি প্রত্যেক প্রজন্মের কোনো না কোনো ব্যক্তিকে আমীন ও সিদ্দীক উপাধি দিত, তবুও সেই উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অনেক বড়ো মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো। কিন্তু আরবের ইতিহাস বলে, আরবরা তাদের সকল যুগে কখনো কাউকে এই উপাধি দেয় নি। বরং

আরবের শত শত বছরের ইতিহাসে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ই (সা.) এক অনন্য উদাহরণ, যাঁকে আরববাসীরা 'আমীন' ও 'সিদ্দীক' উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

অতএব, আরবের শত শত বছরের ইতিহাসে গোটা জাতির পক্ষ থেকে কেবল এক ব্যক্তিকেই 'আমীন' ও 'সিদ্দীক' উপাধি প্রদান এটিই প্রমাণ করে যে, তাঁর আমানতদারী এবং তাঁর সত্যবাদিতা উভয়টিই ছিল সর্বোচ্চ মানের, যার কোনো দৃষ্টান্ত আরবদের জানামতে কোনো ব্যক্তির মাঝে পাওয়া যেত না। আরবরা তাদের সূক্ষ্মদর্শিতার কারণে পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ ছিল। অতএব, তারা যে জিনিসকে দুর্লভ আখ্যা দিয়েছে, তা নিশ্চিতরূপেই জগতে দুর্লভ বিবেচিত হবারই যোগ্য।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আজ জগতের অবস্থা অত্যন্ত ভঙ্গুর। যে দিক থেকে এবং যেভাবেই লক্ষ করা হোক না কেন, মিথ্যা সাক্ষী দাঁড় করানো হচ্ছে। মিথ্যা মামলা-মোকদ্দমা করা তো কোনো ব্যাপারই না। মিথ্যা সনদ বা সার্টিফিকেট তৈরি করে নেওয়া হয়। *এমনকি ভুয়া কাগজপত্রও তৈরি করা হয়।* কোনো বিষয় বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তারা সত্যের দিকটি এড়িয়ে কথা বলে। যেখানে বৈষয়িক সুযোগসুবিধা থাকে সেখানে তারা সত্যকে বাদ দিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। এখন যারা এই জামা'তের প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না, কেউ তাদেরকে জিজ্ঞেস করুক, এটিই কি সেই ধর্ম? *তিনি (আ.) বলেন, আমি জামা'ত গঠন করেছি মূলত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য।* তিনি (আ.) বলেন, এটিই কি সেই ধর্ম যা মহানবী (সা.) নিয়ে এসেছিলেন? আল্লাহ্ তা'লা তো মিথ্যাকে নোংরামি আখ্যায়িত করেছেন এবং তা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন; **فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ** (সূরা আল-হাজ্জ: ৩১) তিনি মূর্তিপূজার সাথে এই মিথ্যাকে সম্পৃক্ত করেছেন; যেভাবে এক নির্বোধ মানুষ আল্লাহ্ তা'লাকে ত্যাগ করে পাথরের দিকে ঝুঁকে পড়ে। *এর মর্মার্থ হলো, তোমরা এজন্য অপবিত্রতা পরিহার করো কারণ এটি একটি অত্যন্ত মন্দ বিষয়। কেননা, মিথ্যা বলাও তোমাদের নোংরামিতে নিমজ্জিত হবার মতো বিষয়। তাই বলেছেন, মূর্তিপূজাও একটি অন্যায় ও নোংরা কাজ।* তিনি (আ.) বলেন, এই মিথ্যাকে মূর্তিপূজার সাথে তুলনা করা হয়েছে। একজন নির্বোধ মানুষ যেভাবে আল্লাহ্ তা'লাকে ত্যাগ করে পাথরের দিকে ঝুঁকে পড়ে, ঠিক তেমনি সে সত্য ও সততাকে পরিহার করে নিজের স্বার্থে মিথ্যাকে প্রতিমায় পরিণত করে। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'লা একে মূর্তিপূজার সদৃশ আখ্যা দিয়েছেন। মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকো, কেননা এটি অনেক বড়ো পাপ, আর মিথ্যা বলাও এর সমতুল্য। যেভাবে একজন মূর্তিপূজারী মূর্তির কাছে পরিত্রাণের জন্য হাত পাতে, তেমনিভাবে একজন মিথ্যাবাদীও নিজের পক্ষ থেকে একটি মূর্তি বানায় এবং মনে করে, এই প্রতিমার সাহায্যে তার পরিত্রাণ লাভ হবে। তাদের কতটা অধঃপতন হয়েছে! তাদের যদি এ কথা বলা হয় যে, তোমরা এই প্রতিমাপূজা কেন করো? এই নোংরামি পরিত্যাগ করো। তখন তারা বলে, এটিকে আমরা কীভাবে পরিত্যাগ করব? এটি ছাড়া তো চলে না! *অর্থাৎ তাদের যদি বলা হয়, প্রতিমার এই অপবিত্রতা তোমরা কেন পরিত্যাগ করো না? তখন তারা বলে, এটি ছাড়া আমাদের চলে না। নিজ স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য আমাদের মিথ্যা বলতে হয়।* তিনি (আ.) বলেন, এর চেয়ে বড়ো দুর্ভাগ্য আর কী হতে পারে যে, মিথ্যাকে নিজ জীবনের ভিত্তি জ্ঞান করে! কিন্তু আমি তোমাদেরকে আশ্বস্ত করছি, অবশেষে সত্যই সফলকাম হয় আর শুভপরিণাম ও বিজয় সত্যেরই হয়।

মহানবী (সা.)-এর জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক স্থানে লেখেন:

মহানবী (সা.) যখন নিজ সহধর্মিণীকে বলেন যে, আমার ওপর এরকম ওহী অবতীর্ণ হয়েছে, তখন স্ত্রী এ কথা বলেন নি, এসব কী আকাশকুসুম কথা বলছ? বরং তিনি বলেন, আপনি বিচলিত হবেন না, আপনি যা কিছু দেখেছেন, সঠিক দেখেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে ধ্বংস করতে পারেন না, কেননা আপনি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন, আপনি নিঃস্বদের সাহায্য করেন, আপনি হারিয়ে যাওয়া পুণ্যসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করেন, আপনি অতিথি আপ্যায়ন করেন, আপনি সত্যের সাহায্য বা সমর্থন করেন। এরপর মহানবী (সা.)-এর সহধর্মিণী তাঁকে (সা.) নিয়ে তার ভাই ওয়ারাকা বিন নওফেলের নিকট নিয়ে যান যিনি ইহুদী শাস্ত্রের একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বিষয়টি শোনামাত্রই বলেন, এটি তেমনই ওহী যেমনটি মূসার ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। আর এটিতে তেমনটিই আজ্ঞা ও নির্দেশমালা বিদ্যমান যেমনটি মূসার ওহীতে ছিল। এরপর তিনি লেখেন; তিনি সাক্ষ্য বর্ণনা করছেন। ইতঃপূর্বেও আমি গত খুতবায় কিছুটা সংক্ষিপ্তভাবে এ বিষয়ে বর্ণনা করেছিলাম। এরপর তিনি (রা.) আরো একটি সাক্ষ্য তুলে ধরেছেন; একটি তো ছিল ওয়ারাকা বিন নওফেলের সাক্ষ্য। এরপর তিনি (রা.) বলেন, বাড়িতে তাঁর (সা.) সদ্য যৌবনে পদার্পণকারী এক চাচাতো ভাই ছিলেন, যিনি যুবকদের মাঝে তবলীগের ভালো মাধ্যম হতে পারতেন। যখন তিনি নিজ ভাই ও ভাবীকে *অর্থাৎ মহানবী (সা.) এবং হযরত খাদীজা (রা.)-কে* গভীর নিষ্ঠার সাথে কোনো এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলতে শোনেন, তখন অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে অগ্রসর হয়ে বলেন, আমিও বিশ্বাস করি আপনি সত্য এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা আপনার সাথে এই বাক্যালাপ করেছেন এবং আপনাকে জগতের সংশোধনের জন্য মনোনীত করেছেন। এরপর তিনি একজন মুক্ত ক্রীতদাসের সাক্ষ্য উপস্থাপন করেছেন যিনি তাঁর সচ্চরিত্রের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে নিজের পিতা-মাতাকে ছেড়ে তাঁর (সা.) দুয়ারে বসে পড়েছিলেন, অর্থাৎ তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। তিনিও যখন সেই চাপা কণ্ঠের কথোপকথন শোনেন এবং নিজ মনিবের চেহারায় চিন্তার ছাপ দেখতে পান তখন সম্মুখে অগ্রসর হয়ে নিজ মনিবের আঁচল ধরে বলেন, হে আমার মনিব! আপনি যা দেখেছেন তা-ই হবে। আপনি যা বলেছেন তা সত্য। আপনি যা দেখেছেন তা সত্য। আপনার মতো মানুষের সাথে নিয়তি কখনো প্রতারণা করতে পারে না। আপনি তো আপাদমস্তক সত্য। নিয়তি আপনার সাথে কীভাবে ধোঁকাবাজি করতে পারে? এখন সেই সময় এসে গেছে যখন আপনার হাতে জগতের সংশোধন হবে। আমাকেও আপনার সাথে থাকার এবং সেবা করার সুযোগ দিন। *আরেকটি সাক্ষ্য রয়েছে।* একজন মাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, যেন একই ঝিনুকে সযত্নে লালিত আরেকটি মুক্তা। তিনি যখন শুনলেন যে, তাঁর বন্ধু অস্বাভাবিক ধরনের কথা বলা শুরু করেছেন আর মানুষ বলছে, হয়ত তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে– তখন তিনি তাঁর কাছে ছুটে যান এবং দরজা খুলিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি যা শুনেছি তা কি সঠিক? তিনি (সা.) যখন তার সামনে ব্যাখ্যা করতে চাইলেন তখন তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কসম! আপনি কোন ব্যাখ্যা দেবেন না! আপনি শুধু এটি বলুন যে, এ কথা সত্য কি না? মহানবী (সা.) ইতিবাচক উত্তর দিলে তিনি (রা.) বলেন, হে আমার সত্যবাদী বন্ধু! আমি আপনার রিসালাতে ঈমান আনছি। আপনি তো আরেকটু হলে আমার সর্বনাশ করছিলেন; দলিল উত্থাপন করে আমার ঈমানকে সংশয়পূর্ণ করে ফেলছিলেন! আমি আপনার সততা এত বেশি প্রত্যক্ষ করেছি যে, আর

কোনো দলিলপ্রমাণের প্রয়োজন নেই। অতঃপর তিনি তথা হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমার বন্ধু! যে আপনার চেহারা একবার দেখেছে, সে কি কখনো আপনার কথায় সন্দেহ করতে পারে? এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, বিরোধিতা হবার কথা ছিল; কেননা ওয়ারাকা বিন নওফেলের ভাষ্য অনুযায়ী,

لَم يَأتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثلِ ما جِئتَ بِه إلّا عودِيَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তিই এমন বাণী নিয়ে এসেছে, সে মানুষের বিরোধিতা থেকে বাঁচতে পারে নি। কিন্তু খোদা তা'লার পরিকল্পনা দেখুন! বিরোধিতার এই ঝড় আসার পূর্বেই খোদা তা'লা কীভাবে তাঁর (সা.) জন্য সাথি সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। মক্কাবাসীদের মধ্য হতে ইসরাঈলী শাস্ত্রের একমাত্র আলেম ওয়ারাকা প্রথম ধাক্কাতেই তাঁর (সা.) সামনে নতজানু হয়ে গেলেন। তাঁর (সা.) পবিত্র সহধর্মিণী খাদীজা (রা.) ওহী শোনামাত্রই তাঁর (সা.) প্রতি ভালোবাসা ও সমর্থনে আপ্লুত হয়েছিলেন। তাঁর যুবক ভাই আলী, যিনি সবসময় তাঁর (সা.) পারিবারিক আচার-আচরণ দেখতেন, তিনি নিজেকে তাঁর (সা.) সেবায় নিয়োজিত করেন। তাঁর মুক্ত ক্রীতদাস যায়েদ, যিনি তাঁর লেনদেন এবং দরিদ্রদের প্রতি তাঁর ব্যবহার গভীরভাবে এবং দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, তিনি তাঁর সত্যতার পক্ষে কসম খাওয়া শুরু করেন। তাঁর শৈশবের বন্ধু, মক্কার শুভাকাঙ্ক্ষী, ভদ্রতার মূর্ত প্রতীক আবু বকর শুধু তাঁর ওহী লাভের দাবির কথাটুকু শুনেই নিজ গলায় আনুগত্যের জোয়াল বেঁধে দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত হন। বিশ্বাস এবং নিষ্ঠার এই অতুলনীয় দৃশ্য তাঁর (সা.) হৃদয়ে কত-না আনন্দের ফল্গুধারা বহমান করে থাকবে! মক্কাবাসীদের হইচই এবং তির্যক কথাবার্তা তিনি কীভাবে হেসে উড়িয়ে দিয়ে থাকবেন আর বলবেন, এটি তোমাদের রায় যারা আমাকের চেনে না; যারা আমার সম্পর্কে বলছ যে, আমি জাদুকর, আমি অমুক, আমি তমুক ইত্যাদি। যারা আমাকে চেনে, এখন তাদের মতামতও শোনো। কীভাবে জীবন দিয়ে তারা আমার ডানে-বামে দাঁড়িয়েছে। হযরত মূসা (আ.) তার বোঝা বহনের জন্য দোয়া করে একজন সাহায্যকারী চেয়েছিলেন। *এখন এখানে আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মূসা (আ.)-এর সাথি এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথিদের মধ্যে তুলনা করা হচ্ছে। এজন্য তিনি হযরত মূসা (আ.)-এর দৃষ্টান্ত এখানে উপস্থাপন করেন যে, হযরত মূসা (আ.) বোঝা বহনের জন্য একজন সাহায্যকারী চেয়েছিলেন।* কিন্তু খোদা তা'লা না চাইতেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পাঁচজন সাহায্যকারী প্রদান করেন, আর এমন সাহায্যকারী যারা বোঝা বহনের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। যদিও ওয়ারাকা বিন নওফেল স্বল্প সময়ের মধ্যে ইন্তেকাল করেছিলেন, তথাপি তিনি তাঁর (সা.) সত্যতার বিষয়ে অভাবনীয় সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। এরপর ১২ বছর পর্যন্ত হযরত খাদীজা (রা.) একজন নারী হয়ে সেই কাজ করে দেখিয়েছেন যা একজন বীরপুরুষের চোখকেও লজ্জায় অবনত করে দেয়। এরপর যায়েদ ২০ বছর পর্যন্ত আত্মত্যাগের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন আর অবশেষে তীক্ষ্ণ তরবারির নীচে নিজের রক্ত দিয়ে প্রমাণ দেন, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাহায্যকারী কীরূপ হওয়া উচিত। হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) তাঁর (সা.) মৃত্যুর পরেও জীবিত ছিলেন এবং খলীফা হয়ে নবরূপে নিজেদের সহযোগী হবার প্রমাণ দিয়েছেন।

এরপর মহানবী (সা.)-এর আদর্শ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (রা.) একস্থানে বলেন:

একজন সত্যবাদী ও সৎ ব্যক্তির সত্যতার প্রমাণগুলো মধ্যে একটি শক্তিশালী প্রমাণ হলো তার নিজ আত্মা যা চিৎকার করে বলে, বিরোধী ও সমর্থকদের সম্বোধন করে বলে,

পরিচিত ও অপরিচিতদের বলে, বিজাতীয় ও ঘনিষ্ঠজনদের বলে– আমাকে দেখো এবং আমাকে মিথ্যাবাদী বলার পূর্বে চিন্তা করে দেখো, তোমরা কি আমাকে মিথ্যাবাদী বলতে পারো? আমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিলে সেই কষ্টিপাথর কি তোমাদের হস্তচ্যুত হয়ে যাবে না যেগুলোর মাধ্যমে তোমরা কোনো বিষয়ের সত্যতা যাচাই করতে পারো? আমাকে প্রতারক আখ্যা দিয়ে কি তোমাদের সেই সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যাবে না, যা অতিক্রম করে তোমরা তোমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য পৌঁছতে পারো?

জগতের সবকিছুই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলে এবং সবকিছু ক্রমশ হয়। পুণ্য যেমন মধ্যবর্তী স্তরগুলো অতিক্রম না করে পূর্ণতায় পৌঁছাতে পারে না, তেমনি মন্দও মধ্যবর্তী স্তরগুলো বাদ দিয়ে শেষ সীমায় পৌঁছাতে পারে না। তাহলে এটি কীভাবে সম্ভব যে, পশ্চিম দিকে ধাবমান ব্যক্তি হঠাৎ নিজেকে পূর্বের সুদূরপ্রান্তে দেখতে পাবে? *এটা হতে পারে না যে, কেউ দৌড়াচ্ছে একদিকে আর পৌঁছে যাচ্ছে অন্যদিকে;* অথবা দক্ষিণ দিকে ধাবমান ব্যক্তি নিজেকে উত্তর দিগন্তে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে। তিনি (সা.) বলেন, আমি আমার পুরো জীবন তোমাদের মাঝে কাটিয়েছি। আমি ছোটো ছিলাম এবং তোমাদের হাতে বড়ো হয়েছি। আমি যুবক ছিলাম এবং তোমাদের চোখের সামনে প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়েছি। নির্জনে ও জনসমক্ষে ঘটা আমার সবকিছু তোমাদের জানা। আমার কোনো কাজ তোমাদের কাছে গোপন নেই এবং কোনো কথা তোমাদের কাছে লুকানো নেই। তাই আমার প্রশ্ন হলো, তোমাদের মাঝে কি এমন কেউ আছে যে বলতে পারে, আমি কখনো মিথ্যা বলেছি? মহানবী (সা.) এই ঘোষণা দিচ্ছেন, কেউ কি আছে যে বলতে পারে, আমি কখনো মিথ্যা বলেছি, অত্যাচার করেছি, ফন্দি এঁটেছি বা ধোঁকা দিয়েছি? অথবা কারো অধিকার খর্ব করেছি কিংবা নিজেকে বড়ো প্রমাণ করতে চেয়েছি বা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছি? প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমরা আমাকে পরীক্ষা করেছ এবং প্রতিটি অবস্থায় আমাকে পরখ করেছ, কিন্তু সর্বদা আমার পদক্ষেপ ভারসাম্যপূর্ণ পথে দেখেছ; সর্বদা ভারসাম্যের ওপর চলতে দেখেছ এবং আমাকে প্রতিটি ত্রুটি থেকে পবিত্র পেয়েছ। এমনকি বন্ধু ও শত্রু সবার কাছ থেকে আমি 'আমীন' (বিশ্বস্ত) ও 'সাদিক' (সত্যবাদী) উপাধি পেয়েছি। তাহলে ব্যাপার কী! কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত তো আমি বিশ্বস্ত ছিলাম, সত্যবাদী ছিলাম, ন্যায়পরায়ণ ছিলাম, মিথ্যা থেকে যোজন যোজন দূরে ছিলাম, সত্যের জন্য নিবেদিত ছিলাম, বরং সত্য আমাকে নিয়ে গর্ব করত; প্রতিটি বিষয়ে ও প্রতিটি ক্ষেত্রে তোমরা আমার ওপর আস্থা রাখতে এবং আমার প্রতিটি কথা তোমরা গ্রহণ করতে; কিন্তু আজ এক দিনে এমন কী পরিবর্তন হয়ে গেল যে, আমি নিকৃষ্টতম ও অপবিত্রতম হয়ে গেলাম! শুধু একটি দাবির কারণে? যে আমি কোনোদিন কোনো মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ে মিথ্যা বলি নি, এখন কি আমি আল্লাহ্‌র নামে মিথ্যা বলতে শুরু করেছি? এত বড়ো পরিবর্তন ও এমন রূপান্তরের কোনো উদাহরণ কি প্রকৃতির বিধানে কোথাও পাওয়া যায়? যদি এক-দুদিনের ব্যাপার হতো তবে তোমরা বলতে পারতে যে, লোক-দেখানোর জন্য এমনটা করছে! যদি এক-দুছরের বিষয় হতো তবে তোমরা বলতে পারতে যে, আমাদের ধোঁকা দেবার জন্য সে এই পথ অবলম্বন করেছে! কিন্তু আমি তো আমার পুরো জীবন তোমাদের মাঝে কাটিয়েছি। শৈশব তোমরা দেখেছ, যৌবন তোমরা প্রত্যক্ষ করেছ, প্রৌঢ়ত্ব অর্থাৎ বার্ধক্য যখন শুরু হয় সেই সময়ও তোমাদের চোখের সামনে কেটেছে। এত বড়ো লোক-দেখানো আচরণ এবং এত কৃত্রিমতা কীভাবে সম্ভব? শৈশবকালে যখন নিজের ভালো-মন্দের খবর থাকে না, তখন আমি কীভাবে কৃত্রিমতা করলাম? যৌবন– যাকে উন্মাদনা বলা হয়– তাতে

আমি প্রবঞ্চনামূলকভাবে নিজের অবস্থাকে কী করে গোপন রাখলাম? কিছুটা তো চিন্তা করো যে, এই প্রবঞ্চনা কখন হলো এবং কে করল? আর যদি চিন্তাভাবনা করে আমার জীবনকে নিষ্কলঙ্ক ও নিঃস্বার্থ পাও, বরং একে পুণ্যের মূর্ত প্রতীক ও সত্যের প্রতিচ্ছবি হিসেবে দেখো, তবে সূর্যকে দেখে রাতের ঘোষণা দিও না! প্রকাশ্য দিনকে রাত বোলো না। আমি এমন যে, আমার বিষয়গুলো দিবালোকের মতো স্পষ্ট। আলোর উপস্থিতিতে অন্ধকারের অভিযোগ কোরো না। তোমাদের কি আমার সত্তা ছাড়া আর কোনো দলিলের প্রয়োজন আছে? আমার সত্তাই হলো সবচেয়ে বড়ো দলিল। আমার আচরিত জীবন ছাড়া আর কি কোনো প্রমাণের দরকার আছে? *আমার পুরো অতীত তোমাদের সামনে আছে, তারপরও তোমরা বলো যে, কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করো?* আমার সত্তা নিজেই আমার সাক্ষী এবং আমার জীবনকালই আমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছে। তোমাদের মধ্য থেকে যদি প্রতিটি ব্যক্তি নিজের মনের গভীরে অবগাহন করে, তবে তার হৃদয় ও তার মস্তিষ্কও এ সাক্ষ্য দেবে যে, সত্য এই ব্যক্তির মাঝে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত আর এ ব্যক্তি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সত্য তাকে নিয়ে গর্বিত এবং সে সত্যের জন্য গর্বিত। এ ব্যক্তি নিজের সত্যতা প্রমাণের জন্য অন্য কোনো জিনিসের মুখাপেক্ষী নয়। এর উদাহরণ হলো– *آفتاب آمد دلیل آفتاب* অর্থাৎ সূর্যের উদয়ই সূর্যের অস্তিত্বের প্রমাণ। এটিই সেই শক্তিশালী প্রমাণ যা আবু বকর (রা.)-র হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিল এবং এটিই সেই শক্তিশালী দলিল যা সর্বদা সত্যপ্রিয় মানুষদের হৃদয়ে স্থান করে নিতে থাকবে। মহানবী (সা.) যখন (নবুওয়তের) দাবি করেছিলেন তখন হযরত আবু বকর তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। সেখানে এক মুক্তকৃত দাসী তাঁকে সংবাদ দেয়, আপনার বন্ধুর স্ত্রী বলছেন যে, তার স্বামী সেই প্রকারের নবী হয়েছেন যেমনটি নবী মূসা (আ.) ছিলেন। তিনি (রা.) তখনই উঠে মহানবী (সা.)-এর বাড়িতে চলে যান এবং তাঁর (সা.) কাছে জানতে চান, আপনি কি একথা বলেছেন, আমি আল্লাহ্‌র রসূল? মহানবী (সা.) হযরত আবু বকরকে বলেন, হ্যাঁ, আমি আল্লাহ্‌র রসূল। হযরত আবু বকর একথা শোনামাত্রই তাঁর (সা.) দাবি মেনে নেন। মহানবী (সা.)-ও তাঁর (রা.) ঈমান সম্পর্কে বলতেন, আমি যাকেই ইসলামের দিকে আহ্বান জানিয়েছি তার পক্ষ থেকেই কিছুটা বাধা, দ্বিধা বা ইতস্ততভাব প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আবু বকরের সামনে যখন ইসলাম উপস্থাপন করা হলো তখন তিনি মোটেও দ্বিধাগ্রস্ত হন নি, বরং সাথে সাথেই ইসলাম কবুল করে নিয়েছিলেন। সেটি কী ছিল যা হযরত আবু বকরকে কোনো নিদর্শন দেখা ছাড়াই মহানবী (সা.)-এর ওপর ঈমান আনতে বাধ্য করেছিল? এটি ছিল মহানবী (সা.)-এর সেই বিবেকসজ্জিত পবিত্র সত্তা যা নিজেই নিজের সত্যতার সাক্ষী। একইভাবে হযরত খাদীজা, হযরত আলী, হযরত যায়েদ বিন হারিসার সাক্ষ্য বর্ণনা করেছি, যারা তাঁর (সা.) সত্যতা দেখে সবাই এর সাক্ষী হয়েছিলেন। মোদ্দাকথা, নবীর সত্যতার প্রথম অভ্যন্তরীণ প্রমাণ হলো তাঁর নিজের সত্তা– যা বাস্তব অবস্থার নিরিখে তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। আর এ সাক্ষ্য এতই জোরালো হয় যে, এর উপস্থিতিতে অন্য কোনো মুজিযা বা নিদর্শনের প্রয়োজনই পড়ে না।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, খোদার বাণী থেকে বুঝা যায়, মুত্তাকী (তথা খোদাভীরু) তারা হয়– যারা নম্রতা ও বিনয়ের সাথে বিচরণ করে। তারা অহংকারমূলক কথাবার্তা বলে না। তাদের কথাবার্তা এমন হয় যেমনটা ছোটোরা বড়োদের সাথে কথা বলে। আমাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে সেটিই করা উচিত যার মাঝে আমাদের কল্যাণ

রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা কারো ঠিকা নেন নি। তিনি কেবল খাঁটি তাকওয়া (তথা খোদাভীতি) চান। যে তাকওয়া অবলম্বন করবে সে উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছাবে। মহানবী (সা.) কিংবা হযরত ইবরাহীম (আ.) কোনো উত্তরাধিকারসূত্রে তো সম্মান পান নি। যদিও আমাদের বিশ্বাস হলো, মহানবী (সা.)-এর সম্মানিত পিতা আবদুল্লাহ্ মুশরিক ছিলেন না; *লোকেরা এ প্রশ্নও তোলে; সেটির উত্তরও তিনি (আ.) এখানে দিয়েছেন যে, আমাদের বিশ্বাস হলো, তাঁর (সা.) সম্মানিত পিতা আবদুল্লাহ্ মুশরিক ছিলেন না;* কিন্তু এটি তো নবুওয়ত পাইয়ে দেয় নি। এটি তো ছিল তাঁর সেই নিষ্ঠার কারণে প্রাপ্ত ঐশী অনুগ্রহ, যা তাঁর প্রকৃতিতে বিদ্যমান ছিল; এটিই ছিল ঐশী অনুগ্রহ আকর্ষণের মূল কারণ। হযরত ইবরাহীম (আ.)– যিনি 'আবুল আম্বিয়া' (তথা নবীদের পিতা) ছিলেন, তিনি নিজের নিষ্ঠা ও তাকওয়ার কল্যাণে নিজের পুত্রকে কুরবানী করতে কোনো দ্বিধা করেন নি। তিনি স্বয়ং আগুনে নিক্ষিপ্ত হলেন এই এক কথার ওপর। তিনি বলেন, আমাদের নেতা ও মনিব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা দেখুন! তিনি (সা.) সব ধরনের কুপ্রথার মোকাবিলা করেছেন, নানা প্রকারের বিপদ ও কষ্ট সহ্য করেছেন, কিন্তু এর কোনো পরোয়া করেন নি। এটিই ছিল সেই নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা– যার কারণে আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহ করেছেন। এ জন্যই তো আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (আল-আহযাব: ৫৭)

'নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন। হে মু'মিনগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করো'। এ আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, মহানবী (সা.)-এর কর্ম এমন ছিল, আল্লাহ্ তা'লা যেগুলোর প্রশংসা করার বা গুণের সীমা নির্ধারণ করার জন্য কোনো বিশেষ শব্দ নির্ধারণ করেন নি; *কোনো বিশেষ শব্দে তা সীমাবদ্ধ করেন নি।* শব্দ তো পাওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ স্বয়ং তা ব্যবহার করেন নি। অর্থাৎ তাঁর (সা.) পুণ্যকর্মের প্রশংসা সীমাবদ্ধ করা যায় না। *পুণ্যকর্মগুলো এমন ছিল যেগুলোকে আমরা সীমাবদ্ধ করতে পারি না।* এ ধরনের আয়াত অন্য কোনো নবীর জন্য ব্যবহৃত হয় নি। তাঁর আত্মার মাঝে সেই সততা ও পবিত্রতা ছিল এবং তাঁর কর্ম আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এতটাই পছন্দনীয় ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা চিরকালের জন্য এই নির্দেশ দিয়েছেন– আগামীতে লোকেরা কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দরূদ পাঠ করবে। তাঁর (সা.) দৃঢ়চিত্ততা ও নিষ্ঠা এমন ছিল যে, আমরা যদি ওপরে বা নীচে দৃষ্টি দেই তবে এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। স্বয়ং মসীহ্র [তথা ঈসা (আ.)-এর] যুগটি দেখে নেওয়া যাক, তাঁর দৃঢ়তা বা আধ্যাত্মিক সত্যতা ও পবিত্রতার প্রভাব তাঁর অনুসারীদের ওপর কতটুকু পড়েছিল! প্রত্যেকেই বুঝতে পারে, একজন দুশ্চরিত্র মানুষকে সংশোধন করা কতটা কঠিন; বদ্ধমূল অভ্যাসগুলো দূর করা কতটা অসম্ভব কাজ! *অভ্যাসগুলো পাকাপোক্ত হয়ে গেলে সেগুলোকে ঠিক করা খুব কঠিন কাজ।* কিন্তু আমাদের পবিত্র নবী (সা.) তো হাজার হাজার মানুষকে সংশোধন করেছেন যারা পশুর চেয়েও অধম ছিল। কিছু মানুষ তো পশুর মতো মা-বোনদের মাঝে পার্থক্য করত না। এতিমদের সম্পদ আত্মসাৎ করত, মৃতদের ধনসম্পদ গ্রাস করত, কেউ কেউ নক্ষত্রপূজারি ছিল, কেউ নাস্তিক ছিল আবার কেউ ছিল প্রকৃতিপূজারি। আরব উপদ্বীপ কী ছিল? তা বহু ধর্মের এক সংমিশ্রণ নিজের ভেতর ধারণ করত। এর ফলে যে মহান কল্যাণ সামনে আসে তা হলো, কুরআন করীম সব ধরনের শিক্ষা নিজের ভেতর ধারণ করে। আর প্রতিটি ভ্রান্ত বিশ্বাস বা মন্দ শিক্ষা যা পৃথিবীতে থাকা সম্ভব, তার মূলোৎপাটনের জন্য

পর্যাপ্ত শিক্ষা এতে বিদ্যমান। এটি আল্লাহ্ তা'লার গভীর প্রজ্ঞা ও সিদ্ধান্ত যে, তিনি মহানবী (সা.)-কে প্রেরণ করেছেন এবং এমন সময় পাঠিয়েছেন যখন অজ্ঞতা চরমে পৌঁছেছিল আর তারপর তিনি (সা.) এই পশুদের মানুষ বানিয়েছেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَّبَارِكْ وَسَلِّمْ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও তাঁর (সা.) সেই উত্তম আদর্শের ওপর চলার এবং কুরআন করীম ও তাঁর (সা.) নির্দেশাবলি অনুযায়ী আমল করে সত্যের মানদণ্ডকে সুউচ্চ করার তৌফিক দান করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)